আলোচনা: মলুয়া – দীনেশচন্দ্র সেন

মলুয়া চন্দ্রাবতীর রচনা। চন্দ্রাবতীর জীবনকথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল-লেখক বংশী ভট্টাচার্জের কন্যা; নেত্রকোনা সব্‌ডিভিসনে পাতুয়ার গ্রামে ইঁহাদের বাড়ী ছিল... ... ।একখানি মলুয়া-কাব্যের পুঁথিতে চন্দ্রাবতীর ভণিতাযুক্ত বন্দনার পদ পাওয়া গিয়াছে। তরুণ বয়সে জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য নামক এক সুরর্শন তরুণ যুবককে ইনি ভালোবাসিয়াছিলেন এবং উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় এই বিবাহ হইতে পারে নাই। চন্দ্রাবতী পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, আজীবন কুমারী রহিয়া গেলেন। জয়চন্দ্র শেষে অনুতপ্ত হইয়া ফুলেশ্বরী নদীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। চন্দ্রাবতী তাঁহার এই দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে যে আঘাত পান, তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। অচিরে তিনিও পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

জয়চন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে রামায়নের বঙ্গানুবাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতা তাঁহাকে ফুলেশ্বরী নদীর পাড়ে একটি শিবমন্দির গঠন করিয়া দেন। কুমারীব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি দিনরাতের অনেক সময় সেইখানে শিবসাধনায় কাটাইতেন। চন্দ্রাবতীর চরিতকথা নয়নচাঁদ ঘোষ নামক এক কবি অনুমান ২৫০ শত বৎসর পূর্বে রচনা করেন... ... ॥

মলুয়া-কাব্য পড়িয়া মনে হয়, চন্দ্রাবতীর আদর্শ ছিল বাল্মীকির সীতা। চন্দ্রাবতী সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বাল্মীকির কাব্যের শব্দগত অনুবাদ করেন নাই। মলুয়া-কাব্যের অনেক স্থলেই সীতাকে মনে পড়িবে। মলুয়া কাজির অশিষ্ট প্রস্তাবের যেরূপ তেজগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সীতার প্রত্যুত্তরের মত, অথচ তিনি বাল্মীকির নকল করেন নাই। সীতা-চরিত্রটি তিনি প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়া বুঝিয়াছিলেন, মলুয়া সীতার প্রতিবিম্ব ণহে, দ্বিতীয় সীতা—সেইরূপই মৌলিক ও স্বাভাবিক—কিন্তু তাহা নকল নহে। সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু যাঁহার চরিত্রগৌরব শত শত বৎসর যাবৎ হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়াছিল, সেই সংস্কারপুষ্ট ধারণা হইতে এই দ্বিতীয় সীতার আবির্ভাব। ইহাতে বাল্মীকির সীতার পবিত্রতা ও তেজ আছে, এবং বাঙ্গালীর আবহাওয়ার কোমলতা ও সুকুমারত্ব আছে।

হিন্দুনারীর তেজ—বীর রমনীর যোগ্য। যে মলুয়া—কাজিকে গর্বিত ভাবে অসমসাহসিকতার সহিত স্পর্ধিতভাষায় অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সে মলুয়া

সামাজিক অত্যাচারে একেবারে নিস্তেজ, নিস্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছিল; যাহার ক্ষুরধার বুদ্ধিতে শত ষড়যন্ত্র বিফল হইয়াছিল, সে যখন সামাজিক অনুশাসনে পরিত্যক্ত হইল, তখন একটি কথা বলিতে সাহসী হইল না। রামায়ণের সীতা সামাজিক নিগ্রহে পরীক্ষা দিয়া সতীত্ব প্রমাণ করিতে চাহিলেন না, ঘৃণায় পাতালপুরীতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু মলুয়া সমাজের নিতান্ত অন্যায় মানিয়া লইলেন, একটিবার প্রতিবাদ করিলেন না—না করিবার কারণ, যে প্রতিবাদ স্বামীর করা কর্তব্য ছিল, তাহা তিনি করেন নাই—বরং দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া সামাজিক শাসনের অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই অপমান ও দুঃখে মলুয়ার সমস্ত প্রতিবাদ কণ্ঠে আসিয়া ফিরিয়া গেল। তিনি কি বলিবেন, যিনি বলিবার তিনি স্ত্রীর সমস্ত অপমান গলাধঃকরণ করিলেন। মলুয়ার তেজস্বিকতা ও দর্প ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল।

তিনি জানিতেন, দুঃখ সহিবার জন্যই তাহাঁর জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং তিনি দুঃখকে ভয় করেন নাই। শেষে জলে ডুবিয়া মরিলেন, এই কাজ তিনি কষ্টে অসহিষ্ণু হইয়া করেন নাই। স্বামীর প্রতি অনুরাগই তাঁহার সমস্ত কার্যের অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। নিজের সমস্ত অলঙ্কারপত্র বেচিয়া খাইয়াও তিনি স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া ছিলেন। তারপরে যখন সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হন, তখনও স্বামীর গৃহে কিছু ধরিতে ছুঁইতে না পারিয়া শুধু তাঁহার মুখখানি দেখিবার লোভে সেই ভিটায় বাহিরের পরিচারিকা হইয়াছিলেন—ইহার মধ্যে কতবার পিতৃগৃহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য ভ্রাতারা আসিল, কিন্তু তিনি তাহাদের সমস্ত স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া চুড়ান্ত কষ্টকে বরণ করিয়া লইলেন। স্বামীপ্রাণতার এই দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বিরল। বিনোদ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পর তিনি সতীনকে যে আদর দেখাইয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অকৃত্রিম। যখন তাহার নিকট চিরবিদায় লইলেন, তখন তাহাকে বলিলেন, 'তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না, আমাকে মনে পড়িয়া দুঃখ হইলে স্বামীর মুখ দেখিয়া ভুলিও।' ... ... ।

সেই শেষদিনকার চরম দুর্দিনে যখন আকাশে মেঘ ও ঝঞ্ঝা, নিম্নে সুত্যা নদীর উত্তাল তরঙ্গ, তখন ভাঙ্গা মন-পবনের ডিঙ্গায় এই অপরূপ রমনী ধীরে ধীরে জলে ডুবিতেছেন। যাহারা দেবী-বিসর্জনের দৃশ্য দেখিয়াছেন, অস্তচূড়ালম্বী শেষ রৌদ্রের রেখায় ঝলমল প্রতিমার মাথার ডুবন্ত মুকুট দেখিয়াছেন, তিনি এই মলুয়ার শেষদৃশ্যের কারুণ্য এবং ভীষন মৃত্যুর এই সুন্দর পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চন্দ্রাবতী নিজে চিরদুঃখিনী ছিলেন, তিনি নিজের দুঃখ দিয়া এই দুঃখিনী মলুয়াকে গড়িয়াছিলেন, তাই মলুয়া চরিত্র এত জীবন্ত হইয়াছে।

এই গল্পটিতে যে 'নজর-মরিচা'র কথা আছে, ইউরোপেও সেই রূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে বিবাহও উপলক্ষে এইরূপ কর আদায় করিতেন।

শুভরাত্রে কন্যার উপর অধিকার শাসনকর্তার থাকিত, অভিভাবকগণ ট্যাক্স দিয়া কন্যাটির মুক্তির ব্যবস্থা করিতেন। এই ট্যাক্সের নাম ছিল 'Droit de Seigneur' (Frazer-এর Folklore in the Old Testament দেখুন)। তান্ত্রিক বঙ্গীয় গুরুরা (সহজিয়া) নিম্নশ্রেনীর মধ্যে 'গুরুপ্রসাদী' নাম দিয়া এই জঘন্য অধিকারের দাবী করিতেন।

বাংলার পুরনারী, দীনেশচন্দ্র সেন

সুদীপ্ত মুখার্জি, ইন্সটিট্যুট অফ ফিসিক্স